দ্বিতীয় অধ্যায়

ফেমিনিজ়ম: লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল

লিবারালিজ়ম (Liberalism) বা উদারতাবাদ এবং র‍্যাডিকালিজ়ম (Radicalism) বা আমূল সংস্কারবাদ উভয়েরই আছে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান। নারীবাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন কিছু বিশেষ সমস্যা যা মূল রাজনৈতিক প্রশ্ন থেকে ভিন্নতর। নারীবাদে সমাজে মেয়েদের স্টেটাস (অবস্থান) নিয়ে আলোচনা করা হয়। নারীর বর্তমান অবস্থান, তার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা, তার অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং অন্তরায় এ-সবই নারীবাদের আলোচ্য বিষয়। সমস্যার পরিচয় দিতে গিয়ে সব নারীবাদীরা একই কথা বলেন না। লিবারাল ফেমিনিস্টরা সমস্যাটিকে যেভাবে দেখেন র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টরা ঠিক সেভাবে দেখেন না।

লিবারালিজ়ম বলতে শুধু একটি রাজনৈতিক অবস্থান বোঝায় না। এই অবস্থানের সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে এক ধরনের মেটাফিসিক্স বা অধিবিদ্যা এবং জাস্টিসের বিশেষ ধারণা। রাজনীতিতে লিবারালিজ়ম বলতে বোঝায় একপ্রকার ইনডিভিজুয়ালিজ়ম (Individualism) বা স্বাতন্ত্র্যবাদ। ব্যক্তির বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও তার কর্মকাণ্ডের পরিধি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে রাখার কথা বলা হয়। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখাটা রাষ্ট্র এবং সমাজের কর্তব্য। ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্র যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয় থাকবে।

লিবারালিজ়মে প্রিন্সিপল তথা বিধিনিয়মের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজকে পরিচালনা করবে কতকগুলি বিধিনিয়ম। সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বিধিগুলি নিরপেক্ষ হয়। নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই বিধিনিয়ম বলবৎ করতে হবে এবং সেগুলি লিঙ্গ-অনপেক্ষ অবশ্যই হবে। নারী ও পুরুষের লিঙ্গ-লাঞ্ছিত পরিচয়কে বাদ দিয়ে তারা কী উপায়ে নিরপেক্ষ বিধায়ক হতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। উদারনৈতিক মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা মনে করেন যে নারী-পুরুষের লিঙ্গ-মোচন সম্ভব নয় কিন্তু লিঙ্গ-উত্তরণ সম্ভব। এটা কীকরে সম্ভব বুঝতে গেলে তাঁদের দেওয়া সেক্স এবং জেন্ডার বিষয়ক

ব্যাখ্যাটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, আর সেই সঙ্গে কিছুটা তাদের মেটাফিসিক্স (metaphysics) বা অধিবিদ্যাগত অবস্থানের সঙ্গে পরিচয় থাকাও আবশ্যক।

সাধারণভাবে সেক্স-আইডেনটিটি (sex-identity) বা যৌন-পরিচয় বলতে ব্যক্তির জৈবিক বৃত্তিকেই বোঝায়। নারী ও পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য তিন জাতীয় পরিচয়ে সূচিত হয়ে থাকে। এগুলি হল ক্রোমোজ়ম-এর গঠন, hormonal makeup বা হরমোনের রসায়ন এবং anatomy বা দেহের গঠন।

নারীর জীবকোষে (female cell) কেবলমাত্র X ক্রোমোজ়ম (chromosome) থাকে এবং পুরুষের জীবকোষে X এবং Y দুই প্রকার ক্রোমোজ়ম থাকে।

নারী ও পুরুষের হরমোন এক। ক্রোমোজ়ম-ভেদে একই হরমোন ভিন্ন ভিন্ন রসায়ন সৃষ্টি করে। সব পুরুষের হরমোনের রসায়ন এক নয় আবার সব নারীরও হরমোনের রসায়ন এক নয়। ফলে পার্থক্যটা শুধু নারী ও পুরুষের পার্থক্য নয়, প্রভেদটা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে দেখা যায়।

নারী-পুরুষের প্রাথমিক যৌনধর্মী পরিচয় (primary sex-linked characteristics) ক্রোমোজ়মের দ্বারা নিরূপিত হয় এবং দ্বিতীয় স্তরের যৌনধর্মী-পরিচয় (secondary sex-linked characteristics) নির্ধারিত হয় হরমোনের রসায়নের দ্বারা। তৃতীয় পর্যায়ের যৌন পার্থক্য (tertiary sex-linked difference) ঘটে প্রথম দুটি পরিচয়ের ওপর এনভাইরনমেন্ট (environment) বা পরিবেশের প্রভাবের ফলে। অর্থাৎ ক্রোমোজ়ম, হরমোন ও পরিবেশের মিলিত প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন মনে করা হয় যে পুরুষ বেশি যুক্তিবাদী—সে গণিত এবং যুক্তিবিদ্যায় পারঙ্গম এবং নারী বেশি সংবেদনশীল (emotional)—গান, ছবি-আঁকা এবং সাহিত্যে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বা বলা হয় যে পুরুষ কর্তৃত্ব ফলাতে ভালবাসে আর নারী কোনো এক কর্তার অধীনে থাকলে আশ্বস্ত বোধ করে। আবার বলা হয় পুরুষ স্পষ্ট এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আর নারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সদাই দ্বিধাচ্ছিন্ন।

পুরুষ আর নারীর গুণগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে একটা তালিকা প্রস্তুত করলে দেখা যাবে পুরুষোচিত গুণ ও নারীসুলভ গুণগুলি সর্বদাই একে অন্যের বিপরীত। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে নারী ও পুরুষের জৈবিক গঠনের পার্থক্যের দরুন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য গড়ে উঠেছে।

আমরা এ পর্যন্ত সেক্স-আইডেনটিটি বা যৌন-স্বরূপের বৈশিষ্ট্যগুলি বলেছি। কিন্তু নারীবাদীরা আর এক ধরনের পরিচয়ের কথাও বলেন, সেটা হল জেন্ডার-আইডেনটিটি

(gender identity)। তৃতীয় পর্যায়ের যৌন-পরিচয়ের সঙ্গে জেন্ডার বা লিঙ্গ-পরিচয়ের সাদৃশ্য আছে। যেমন হঠকারিতা/সহনশীলতা, অধিনায়কত্ব/নমনীয়তা, চঞ্চলতা/ধৈর্য— মনে করা হয় এ-সবই লিঙ্গ-বৈশিষ্ট্য। ওপরের দ্বিকোটিক বিভাজনের প্রথমোক্ত পরিচয়টি সাধারণত পুরুষের ধর্ম, যেমন হঠকারিতা, অধিনায়কত্ব, চঞ্চলতা, এবং দ্বিতীয় ধর্মগুলি নারীর ধর্ম বলে মনে করা হয়।

জেন্ডার-আইডেনটিটি বলতে কতকগুলি কন্সট্রাকটেড বা সৃজিত ধর্মকেই বোঝায়। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি সভ্য সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে বিশেষ কতকগুলি আচরণ প্রত্যাশা করে। এই আচরণ যারা অনুশীলন করে তাদের 'আদর্শ' নারী এবং 'আদর্শ' পুরুষরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে—আর এই গুণগুলি যথাক্রমে পুরুষালি গুণ ও মেয়েলি গুণ রূপে গণ্য হয়। সমাজ প্রত্যাশা করলেই যে যে-কোনো নারী বা পুরুষ সেইমতো আচরণ করবে তা না-ও হতে পারে। একজন নারী ইচ্ছে করলে পুরুষের গুণের চর্চা করতে পারে অথবা একজন নারীর কাছ থেকে যে চর্যা প্রত্যাশা করা হয় তা একজন পুরুষ অনুকরণ করতে পারে। এর ফলে দেখতে পাওয়া যাবে পুরুষালি নারী ও মেয়েলি পুরুষ। জেন্ডার বা লিঙ্গ-পরিচয় সমাজ-আরোপিত বলেই এইরূপ সম্ভব। লিঙ্গ-পরিচয় নারী ও পুরুষের সহজাত ধর্ম হলে এর থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা ভাবা যেত না।

যৌন-স্বরূপকে যদি সহজাত বলা হয় এবং লিঙ্গ-স্বরূপকে যদি সৃজিত বলা হয় তবে প্রশ্ন জাগে: এই দুই স্বরূপের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ আছে কি না? অনেকে মনে করেন যে যৌন-স্বরূপ অনুযায়ী সমাজ লিঙ্গ-ধর্ম নির্মাণ করে থাকে। সংক্ষেপে এই সম্পর্কটিকে বোঝানোর জন্য বলা হয় ('gender is wired into biology')। এখানে একটি বৈদ্যুতিক তারের উপমা ব্যবহার করে যেন বলা হচ্ছে যে লিঙ্গ-পরিচয়ের সূত্র যৌন-পরিচয়ের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই মত অনুসারে কার্য-কারণ সম্পর্কে এই অভিমুখের কোনো বিকল্পও কল্পনা করা যায় না। তার কারণ হিসেবে বলা হয় যে anatomy is destiny। এর মানে জন্মসূত্রেই স্থির হয়ে যায় সারাজীবন কোন আচরণ নারীর পক্ষে আদর্শ আচরণ হবে আর কোনটি পুরুষের পক্ষে শোভন। ক্রোমোজম আর হরমোন দিয়েই যেন নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায়। এই ব্যাখ্যায় আমরা পাই এক প্রকার 'বায়োলজিজ়ম' (biologism) বা জৈবকেন্দ্রিক মতবাদ—জি. ই. ম্যুর হয়তো এখানে একটা 'ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসি' (naturalistic fallacy) বা প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তিরও আভাস পেতেন। কারণ এখানে বলা হচ্ছে 'তুমি যা হয়ে জন্মেছ তোমার জীবনের আদর্শ

তাই দিয়েই স্থির হওয়া উচিত।' আমরা যখন বাস্তব অবস্থা থেকে আদর্শ অবস্থাকে পাবার চেষ্টা করি বা আমরা যখন 'is' থেকে 'ought'-এ পৌঁছানোর চেষ্টা করি তখনই এমন ফ্যালাসি বা অনুপপত্তির জন্ম হয়।

কিছু নারীবাদী মনে করেন যে জৈব-স্বরূপকে যখন অস্বীকার করা যায় না তখন এই বাস্তব অবস্থাটা মেনে নিয়েই নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে ভাবা যেতে পারে: নারী আর পুরুষ উভয়ে মিলে সংসার রচনা করে বলে তাদের গুণগুলি কমপ্লিমেনটারি বা পরিপূরক। একের প্রয়োজন অপরকে, কারণ এককভাবে তারা অপূর্ণ এবং খণ্ডিত—যদিও তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং অনন্য। এই অবস্থানটি লিবারালও নয়, র‍্যাডিকালও নয়, এটি একটি এসেনশিয়ালিস্ট (essentialist) অবস্থান বা অপরিহার্য অবস্থান।

উপরোক্ত মতটি সেকেলে অতএব উপেক্ষণীয় এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। ধর্মযাজকরা এই মত আজও সমর্থন করেন এবং কিছু নারীবাদীও এই মত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন পুরুষ ও নারীর যৌন-পরিচয় ও লিঙ্গ-পরিচয় পৃথক। শুধু তাই নয়, তাঁরা অনেকে মনে করেন পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিকতর গুণান্বিত কারণ নারীর দরদ আছে, ধৈর্য আছে, সে সহনশীল এবং সেবাপরায়ণ। এই গুণগুলি মানুষের ভাল থাকার পক্ষে অপরিহার্য। যুদ্ধ, হানাহানি, আগ্রাসন কখনই সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে না।

ইদানীং অর্থনীতি, রাজনীতি এবং নীতিশাস্ত্রে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়: 'quality of life', অর্থাৎ জীবনের গুণগত মান। জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি করাটাই নৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়। যে নারীবাদীরা এসেনশিয়াল অবস্থান সমর্থন করেন তাঁরা মনে করেন যে সমাজে নারীসুলভ ধর্মগুলি প্রাধান্য পেলে এবং নারীর অভ্যস্ত প্রেক্ষিত থেকে মানব সংসারের সমস্যার বিচার করলে বিচার অধিকতর মানবিক হবে। এই নারী-কেন্দ্রিক মতটিকে বলা হয় গাইনোসেনট্রিজ়ম (gynocentrism)। এটি পিতৃতন্ত্রের বিপরীত। নারী-নিসর্গনীতির বা ইকোফেমিনিজ়ম-এর কথা যাঁরা বলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নারী-কেন্দ্রিকতার সপক্ষে যুক্তি দেন। এঁরা আরণ্যক সভ্যতায় ফিরে যাবার কথাও বলেন। এটাও বলা হয় যে নারীকে সক্ষম করে তুলতে হলে তার সেবাবৃত্তির প্রচলিত ভূমিকায় সক্রিয় থেকেই তাকে সক্ষম হতে হবে, কারণ সেটাই তার শক্তির উৎস।

এমন যুক্তি প্রায়ই শোনা যায় যে অন্দরমহলে থেকেও নারী যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হতে পারে। ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার জন্য তার বাইরের জগতে পুরুষের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেবার প্রয়োজন নেই। প্রায় সব সমাজেই নারীকে দেওয়া হয় সেই সমাজের নৈতিক আদর্শ

পালনের দায়িত্ব। আশা করা হয় নারী ব্যক্তিজীবনে ধর্মের পথে চলবে এবং পরিবারকে ন্যায়ের পথে চালিত করবে। বিপথগামী পুরুষকে ধর্মের পথে ফেরাতে পারে যেন নারী-ই। ফলে সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিবাহ যেন একটি প্রতিষেধক।

নারীকে নৈতিক পাহারাদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই পুরুষের ক্ষেত্রে যা দূষণীয় নয় নারীর ক্ষেত্রে সেই আচরণ দূষণীয়। আমাদের শব্দকোষে এমন কতকগুলি শব্দের ব্যবহার আছে যা কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পুরুষদের ক্ষেত্রে তার কোনো তুল্য প্রয়োগ নেই। 'শ্লীলতাহানি' নারীর হয়, পুরুষের হয় না। 'রক্ষিতা'র কোনো পুংলিঙ্গসূচক শব্দ নেই। এর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিতুলনা পুরুষদের জন্য নেই। স্ত্রীর 'সতীন' থাকতে পারে, পুরুষের থাকে না। স্ত্রীলোক 'ডাইনি' হতে পারে, কোনো অনুরূপ ভূমিকা পুরুষের নেই, তেমনি সতীত্ব নারীর-ই ভূষণ।

নারীর ক্ষেত্রে যে ভূমিকাগুলি নিষিদ্ধ বা পাপের, পুরুষের ক্ষেত্রে তা নয়। এর একটা ব্যাখ্যা হতে পারে যে পুরুষকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়। অথবা আর একটা বিকল্প ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। স্ত্রী-জাতির কাছে আরো অনেক উচ্চ আদর্শ প্রত্যাশা করা হয়। সে জননী, সে লক্ষ্মী, সে সরস্বতী, এবং এমন আরো অনেক কিছু আখ্যায় ভূষিত হয়। এক কথায় বলতে গেলে নারী হল দেবীতুল্য।

নারীকে অকলুষিত রাখার জন্য সমাজকে নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে, অন্দরমহলের মতো একটা সুরক্ষিত এলাকা রচনা তার অন্যতম। এই মত অনুসারে নারীবাদের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। কারণ রাজনীতির জগৎ সর্বদাই কলুষিত। মনে পড়ে যায় জাঁ-পল সার্ত্র-র (Jean-Paul Sartre 1905–1980) বিখ্যাত নাটক *Dirty Hands*-এর কথা। সেখানে নায়ক কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বাঁচতে গেলে তাকে সক্রিয় রাজনীতি করতে হবে অথচ সে যে-দলেই যায় সেখানেই তাকে তার আদর্শের সঙ্গে 'কমপ্রোমাইজ' বা সমঝোতা করতে হয়। এই নাটকের নায়কের অনুভূতি হয় যে, হাত ময়লা না-করে রাজনীতি করা যায় না। রাজনীতি করলে এই কথাটি নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবার কথা। তবে কেন সে সুরক্ষিত অন্দরমহল ছেড়ে এই আবিলতায় মগ্ন হতে চাইছে? এই প্রশ্নের উত্তর লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টরা সমস্বরে দেবেন। তাঁরা বলবেন, কে বলেছে অন্দরমহলে রাজনীতি নেই? আবিলতা অন্দরমহলকেও স্পর্শ করে। অন্দরমহলের রাজনীতিকে চিনতে মেয়েদের সময় লেগেছে।

অন্দরমহলের রাজনীতি সনাক্ত করার পরে একটা শ্লোগান তৈরি হয়েছে: 'The personal is political'। শ্লোগানটি উদারপন্থী নারীবাদীরা গ্রহণ করেছেন, সংস্কারকামী নারীবাদীরাও গ্রহণ করেছেন। 'দ্য পারসোনাল ইজ় পলিটিকাল' বলতে বোঝায় যে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে ক্ষমতার প্রতাপ, স্বার্থপরতা, বঞ্চনার একটা রাজনীতি চলতে থাকে। এই সম্পর্কগুলি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হতে পারে, শাশুড়ি-বৌয়ের সম্পর্ক হতে পারে, বা পরিবারের অপর কোনো সম্পর্ক হতে পারে। এর ফলেই সৃষ্টি হয় বৈষম্য। কন্যা-সন্তানের চেয়ে পুত্র-সন্তান বেশি সুযোগ পেতে পারে, বৃদ্ধ বাবা-মা অবহেলিত হতে পারেন।

এই সমস্যাগুলির একটি নির্দিষ্ট আদল থাকতেও পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। এই সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিক সমস্যারূপে দেখা হবে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। 'দ্য পারসোনাল ইজ় পলিটিকাল' বলার মধ্যে দিয়ে সম্পর্কের রাজনীতির উপস্থিতি স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। এখানে রাজনীতি বলতে এক ধরনের ক্ষমতার আস্ফালনকে বোঝানো হচ্ছে।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের রাজনীতিতে কী করে সুবিচার পাওয়া যায় সে-বিষয়ে লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন।

লিবারাল নারীবাদীরা মনে করেন যে ব্যক্তি-জীবনে সুবিচার পেতে গেলে ন্যায়নীতির দ্বারস্থ হতেই হবে। তাঁদের মতে ন্যায়নীতির কোনো লিঙ্গ-পরিচয় নেই, 'প্রিনসিপল অব জাস্টিস' (principle of justice) বা ন্যায়-বিধির কোনো পক্ষপাত থাকতে পারে না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-নির্বিশেষে ন্যায়বিচার সকলেরই প্রাপ্য এবং সকলের ক্ষেত্রে একই বিধি সমানভাবে প্রযোজ্য। এমন নিরপেক্ষ বিধি পেতে গেলে বিধিকে যুক্তিনিষ্ঠ হতে হবে। তাঁরা এমন বিধির সন্ধান করছেন যা নারী পুরুষের লিঙ্গ-পরিচয়ের উর্ধ্বে।

লিবারাল নারীবাদীরা মনে করেন যে 'জাস্টিস' বা ন্যায়নীতির কোনো 'সেক্স-আইডেনটিটি' নেই এবং কোনো 'জেন্ডার-আইডেনটিটি' নেই। এটা কী করে সম্ভব যে, যে-মানুষের যৌন ও লিঙ্গ-পরিচয় আছে সেই মানুষ যখন আইন প্রণয়ন করে, বিধি রচনা করে, তখন সে দেশ-কাল বর্জিত নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান নিতে পারে? এর ব্যাখ্যা পেতে গেলে একটু খুঁটিয়ে যৌন ও লিঙ্গ-প্রভেদ সম্বন্ধে লিবারাল নারীবাদীদের মতটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। লিবারাল নারীবাদীরা কখনোই বলবেন না যে জন্মসূত্রে স্থির হয়ে যায় সারা জীবন কোন আচরণ নারীর পক্ষে আদর্শ আচরণ হবে। অথবা তাঁরা বলবেন না যে

লিঙ্গ-পরিচয়ের সূত্র যৌন-পরিচয়ের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। লিবারাল মতের ওপর দেকার্ত-এর অধিবিদ্যার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দেকার্ত দুটি পদার্থ স্বীকার করতেন—'মাইন্ড' (mind) বা মন, এবং ম্যাটার (matter)—যার মধ্যে বডি বা দেহ অন্তর্ভুক্ত। আমাদের জৈবিক পরিচয় দেহের দ্বারা নিরূপিত হয়—সেখানে ক্রোমোজ়োম বা হরমোনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষের মন তো চলে যুক্তির নিয়মে। যুক্তির বলে মানুষ রচনা করে আইন, দর্শন, বিধিব্যবস্থা, এক কথায় যাকে বলে 'কালচার' (সংস্কৃতি)।

কোন কালচারে নারীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত এবং পুরুষের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা মানুষ যুক্তি দিয়ে নির্মাণ করে। ফলে ব্যক্তির যৌন-পরিচয়—অর্থাৎ তার ক্রোমোজ়মের গঠন ইত্যাদি যদিও সহজাত, তার লিঙ্গ-পরিচয়—যেমন নারী সেবাময়ী আর পুরুষ প্রতিহিংসাপরায়ণ, এই ধরনের পরিচয়—সমাজ-আরোপিত প্রত্যাশা। সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনার জন্য নারী-পুরুষের এ জাতীয় ভূমিকার বিভাজন প্রয়োজন হতে পারে। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নতুন ভূমিকা নির্মাণ করা যেতে পারে।

সমাজে আইন প্রণয়নের সময় চেষ্টা করা হয় যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তগুলিকে আইনের রূপ দেবার। এই সংস্কারটি প্রাচীন গ্রিসের যুগ থেকে চলে আসছে। যদিও দেকার্তকে 'আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক' রূপে স্বীকার করা হয় তবুও বলা যায় যে 'মানুষ যুক্তিচালিত জীবনযাপন করলে সে আদর্শ জীবনযাপন করতে পারবে' ধরনের কথা আমরা প্লেটোর 'রিপাব্লিক'-এও পেয়েছি। প্লেটো বলছেন আমাদের 'অ্যাপেটাইট' বা জৈবিক প্রয়োজনকে যুক্তির বশে রাখা শ্রেয়।

'যুক্তি' বলতে কী বোঝায় তার আরো স্পষ্ট রূপ আমরা পেলাম অ্যারিস্টটলে এসে। তিনি চিন্তনের বিধি বা লজ় অব থট-এর কথা বলছেন।[১] এই ট্রাডিশন দেকার্ত-এ এসে শেষ হয়নি, পরবর্তীকালে কান্টও আমাদের বলছেন যে বিশুদ্ধ যুক্তি-অনুগামী সিদ্ধান্তগুলিই একমাত্র নৈতিক।

আমাদের সমসাময়িক কালে জন রলস-এর (John Rawls 1921–2002) লেখায় পাই যে যুক্তি-অনুসরণ করে চলাটাই ন্যায়নিষ্ঠ হবার একমাত্র উপায়। মানুষ চায় সর্বতোভাবে যুক্তির দ্বারা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে। এটাই লিবারাল ট্রাডিশনের মূল কথা, লিবারাল নারীবাদও সেই পথই অনুসরণ করে। তাঁরা মনে করেন সর্বদাই চেষ্টা করতে হবে কোনো একটা প্রিন্সিপল (principle) মেনে কাজ করতে, তাহলেই কাজটা ন্যায্য হবে, পক্ষপাত-দোষ এড়ানো যাবে।

লিবারাল নারীবাদীরা মনে করেন রিজ়ন বা যুক্তির কোনো লিঙ্গ-পরিচয় নেই। মানুষ যখন যুক্তি ব্যবহার করে তখন সে তার ব্যক্তিগত লিঙ্গ-পরিচয়কে অতিক্রম করে যায়। যদি কেউ লিঙ্গ-পরিচয় বলবৎ রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করে তবে সেটা অন্যায় হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে 'নারী'/'পুরুষ' এই পরিচয়ের অতিরিক্ত আমাদের প্রত্যেকের আর একটা পরিচয় আছে—যেখানে আমরা মানুষ। এবং সেই মানুষ পরিচয়ে আমাদের অনুগত সামান্যধর্ম এই যে আমরা র‍্যাশনাল অ্যানিমাল (rational animal) বা যৌক্তিক জীব।

লিবারাল নারীবাদীদের মতে আমরা সবাই তিনটি পরিচয় বহন করি: প্রথমটি আমাদের যৌন-পরিচয়, দ্বিতীয়টি আমাদের লিঙ্গ-পরিচয়, এবং আমাদের তৃতীয় পরিচয় হল আমরা মানুষ। তৃতীয়টি এই প্রথম দুটিকে অতিক্রম করে যায়।

তত্ত্ব-নির্মাণ করার সময় ও বিধি-প্রণয়নের সময় আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে 'মানুষ' পরিচয়ের বিরোধী কোনো পরিচয় আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করে। এইভাবে লিবারাল নারীবাদীরা চান একটা বিশুদ্ধ ইতিহাস-অনপেক্ষ (history-neutral) তত্ত্বের কোটি নির্মাণ করতে যেখানে বিশুদ্ধ যুক্তিই হবে একমাত্র চালিকাশক্তি। দৈনন্দিন জীবনযাপনে কখনো কোথাও যদি লিঙ্গ-বৈষম্য দেখা যায় তবে বুঝতে হবে যে সেখানে হয় বিশুদ্ধ যুক্তি তার নিয়ামক ভূমিকা হারিয়েছে অথবা সেখানে কোনো তত্ত্বের অপপ্রয়োগ ঘটেছে। তত্ত্বের নিজস্ব কোনো লিঙ্গ/পক্ষপাত নেই।

বিভিন্ন শাস্ত্রে এমন কতকগুলি তত্ত্ব থাকতে পারে যেখানে লিঙ্গ-সমস্যাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তত্ত্বের ক্ষেত্রেও এ-জাতীয় ত্রুটিকে তত্ত্বের অনবধান দোষ বা 'এরর অব অমিশন' (error of omission) বলা যেতে পারে। লিবারাল ফেমিনিস্টরা মনে করেন যে তত্ত্ব সক্রিয়ভাবে কোনো লিঙ্গ-রাজনীতিতে লিপ্ত হতে পারে না। অর্থাৎ তত্ত্বের ক্ষেত্রে 'এরর অব কমিশন' (error of commission) ঘটতে পারে না। নারীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত কোনো সমস্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হলে এর জন্য প্রচলিত যে-কোনো তত্ত্ব কাঠামো বেছে নেওয়া যেতে পারে। যেমন লিঙ্গ-বৈষম্যের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, অথবা ফ্রয়েডের তত্ত্ব-কাঠামো বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী লিঙ্গ-বৈষম্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই প্রকল্পটিকে বলা হয় অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প বা 'মেথড অব ইনক্লুশন' (method of inclusion)।

লিবারাল নারীবাদীরা ইনক্লুশনের প্রকল্পটিকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন। যে-অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন হয়নি তার তাত্ত্বিক পর্যালোচনার

জন্য অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন 'অ্যাবর্শন' ধ্রুপদী নীতিদর্শনে আলোচ্য বিষয়ই ছিল না। এবার নারীর অভিজ্ঞতাকে তত্ত্ব-কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পরূপে 'অ্যাবর্শন' নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, নারীর অভিজ্ঞতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যদি দেখা যায় যে একটি অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের এবং ব্যাখ্যার অযোগ্য তাহলে মনে করা হয় যে তা তাত্ত্বিক পরীক্ষারও অযোগ্য।

অপর এক অনুষঙ্গেও অন্তর্ভুক্তির কথা লিবারাল নারীবাদীরা বলেন—সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে। তাঁরা চান মেয়েদের যেন মূল সামাজিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁদের যেন পুরুষদের সমান শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়, কর্ম-নিযুক্তির অধিকার দেওয়া হয়।

এই উদ্দেশ্যে লিবারাল নারীবাদীরা আমেরিকায় ১৯৬৬-তে একটি সংগঠন (NOW—National Organization for Women) তৈরি করে তাঁদের দেশের রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাছে আট-দফা দাবি পেশ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যেন নারী-সমাজের এই দাবিগুলিকে রাজনৈতিক দলগুলি অন্তর্ভুক্ত করে:

(১) সংবিধান-সংশোধনের মাধ্যমে সমান অধিকার প্রদান।

(২) নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য আইন করে নিষিদ্ধ করা।

(৩) কর্মক্ষেত্রে মেটার্নিটি লিভের (maternity leave) অধিকার এবং সোশাল সিকিউরিটি-র (social security) সুবিধা।

(৪) কর্মরত অভিভাবকদের শিশু এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আয়করে ছাড় (income tax relief) দেওয়া।

(৫) শিশুদের দেখাশোনার জন্য কেন্দ্র (crèche) নির্মাণ।

(৬) সমান শিক্ষা এবং একই প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালাভের অধিকার (co-education)।

(৭) কর্মক্ষেত্রে সমান প্রশিক্ষণের (training) অধিকার এবং দরিদ্র মহিলাদের জন্য ভাতার (allowance/subsidy) ব্যবস্থা।

(৮) মহিলাদের নিজেদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকার (reproductive rights)।

NOW আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়। ওপরের আটটি দাবিই আইনের সাহায্যে আদায় করা যেতে পারে। লিবারাল নারীবাদীরা যখন বাহ্যজগতের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন তখন তাঁরা বাইরের সমাজের প্রচলিত ছাঁচটি বদলের কথা বলেন না। যেমন তাঁরা বলেন না যে, বাজারকেন্দ্রিক

অর্থনীতিই (market economy) সমাজে মহিলাদের অনুন্নত অবস্থার জন্য দায়ী; অতএব বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির বদল করতে হবে। একটি সমাজে কী-জাতীয় অর্থনীতি বহাল রয়েছে সেটা তাঁদের বিচার্য নয়, তাঁদের কাছে প্রশ্নটা হল: অর্থনীতির চেহারা যাই হোক না কেন মেয়েরা সেখানে অদৃশ্য কেন? মেয়েদের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে হবে— আর এর জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি লিবারাল নারীবাদীরা ব্যক্তিজীবনের হেনস্তা নিয়েও সোচ্চার। আশ্চর্যের বিষয় যে, মেয়েরা গৃহস্থালির যে কাজ করে তাকে 'শ্রম' (labour) বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। রান্না, সেলাই, কাপড়-কাচা, ছেলে-পড়ানো এগুলি স্বীকৃত শ্রম নয়। কিন্তু এই একই কাজ যখন বড় পুঁজির দ্বারা পুষ্ট হয় তখন কাজটা ছেলেদের হাতে চলে যায় এবং একই কাজ তখন 'শ্রম' বলে বিবেচিত হয়। হোটেলের রান্না, ড্রাইক্লিনিং-এ কাপড় কাচা, দর্জির কাজ স্বীকৃত 'শ্রম'। তখন ছুটিছাটা এবং ভাতাসহ আরো অনেক দাবির প্রশ্ন ওঠে। গৃহস্থালির কাজকে ঘিরে যে রাজনীতি চলে সেটা লিবারালদের ভাবায়। তেমনি ভাবায় বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম ও বিজ্ঞাপনের ভাষায় ও চিত্রে নারীর অবমাননা। এর প্রতিকার হিসেবে তাঁরা আরো কড়া আইন চান। প্রকারান্তরে এটাও একধরনের অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প। যে-ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আইনের অঙ্গনের বাইরে ছিল, দাবি করা হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা আইনের অন্তর্ভুক্ত হোক। ম্যারিটাল রেপ (marital rape) বা বৈবাহিক ধর্ষণ যে আজ আইনের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে এ-ও অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ার ফলে সম্ভব হয়েছে। যে-আচরণকে একান্ত ব্যক্তিগত মনে করা হত সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এখন আইনের দৃষ্টিতে বিচার্য বিষয়। বলা যেতে পারে the personal is political, অর্থাৎ যা কিছু ব্যক্তিক তাই রাজনৈতিক, মনে করার এটি একটি কাম্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

লিবারাল নারীবাদীদের দ্বারা স্বীকৃত তিন ধরনের অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ করা হল: প্রতিষ্ঠিত চিন্তাতন্ত্রে নারীর অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্তি, দ্বিতীয়ত, সব রকম সামাজিক চর্যায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অন্তর্ভুক্তি, এবং, সব শেষে, আইনের অঙ্গনে একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্তি।

এই তৃতীয় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, যুক্তি ও বিচার যত প্রসার লাভ করবে ততই অবদমন কমবে আর সেই অনুপাতে নির্যাতনের লাঘব হবে। যুক্তি কোনো গোপন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, যুক্তি সর্বদাই সর্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য। ব্যক্তিগত সমস্যাকে যুক্তির আদালতে পেশ করার অর্থ হল ব্যক্তিগত তখন আর নিছক ব্যক্তিগত থাকে না।

এর ফলে লিবারাল নারীবাদীদের একটু অসুবিধে হওয়ার কথা, কারণ লিবারাল দর্শনে পাবলিক এবং প্রাইভেট অর্থাৎ 'দেওয়ানি আম' এবং 'দেওয়ানি খাস'-এর মতো এই দ্বিকোটিক ভাগটি অত্যন্ত জরুরি মনে করা হয়। অথচ লিবারাল নারীবাদীরা যেভাবে the personal is political কথাটির মোকাবিলা করেন তাতে এই বিভাজনের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। অন্তর্ভুক্তির ফলে ধীরে ধীরে পার্সোনাল যেন নৈর্ব্যক্তিক বিধির বিচারাধীন হয়ে যায়। এখানে লিবারালদের যুক্তিটি এ রকম, ব্যক্তিগত সমস্যাকে আইনের আওতায় এনে তাঁরা গোপনীয়তা হারাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু পরিবর্তে সুবিচারের মাধ্যমে তাঁরা অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন।

প্রচলিত দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি কোনোটিকেই বদল না-করে লিবারাল নারীবাদীদের অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পগুলি র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা সুনজরে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। সব রকম লিঙ্গ-বৈষম্যের মূলে রয়েছে পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে না-পারলে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কোনোদিন দূর হবে না। লিবারাল নারীবাদীরা যে-রাষ্ট্রের, যে-আইন-ব্যবস্থার কাছে সুবিচার প্রত্যাশা করছেন সেটা নিজেই একপেশে এবং পিতৃতন্ত্রের মদতপুষ্ট। মূলস্রোতের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন না-তুলে মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে নারী স্বয়ং পিতৃতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠবে।

লিবারাল নারীবাদীদের কাছে র‍্যাডিকাল নারীবাদীদের প্রশ্ন: সুবিচারের আশায় যখন ব্যক্তিগত কোটিকে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা হচ্ছে তখন কি নারী গৃহস্বামীর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়ে আরো বৃহৎ পটভূমিতে রাষ্ট্ররূপী পিতৃতন্ত্রের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে না?

আমেরিকায় র‍্যাডিকাল নারীবাদের জন্ম ১৯৬৭-তে। একদল মহিলা NOW-এর সদস্যপদ ত্যাগ করে একটি বিকল্প গোষ্ঠি রচনা করেন। এঁরা মনে করতেন NOW-এর সদস্যরা অত্যন্ত বেশি রক্ষণশীল। র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টদের অনেকে তথাকথিত 'নিউ লেফট' (New Left) বা নব্য-বামপন্থী ছিলেন, এঁদের অনেকের সঙ্গে আবার উত্তর-আধুনিকদের (post-modern) সরাসরি যোগ ছিল।

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মনে করেন না যে anatomy is destiny। তাঁরা শারীরিক বৃত্তিকে সম্পূর্ণ যুক্তির নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাবও খারিজ করে দেন। তাঁরা দেকার্ত-এর মতো বলতে রাজি নন যে মন শরীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের মতে, আমাদের যৌন-পরিচয় যেমন আমাদের লিঙ্গ-পরিচয়কে প্রভাবিত করে, তেমনি আবার আমাদের লিঙ্গ-পরিচয়

আমাদের যৌন-পরিচয়ে বিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ, আমাদের জন্মগত স্বরূপ বা নেচার (nature) এবং আমাদের রচিত স্বরূপ বা জেন্ডারের (gender) মধ্যে একটা উভয়মুখী সম্বন্ধ রয়েছে। এই দু'য়ের মধ্যে সম্পর্কটা একরৈখিক নয়।

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা লিবারাল নারীবাদীদের মতো অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প সমর্থন করেন না। একটা নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ সাধারণীকরণের (impersonal, neutral generalisation) সম্ভাব্যতা তাঁরা খারিজ করে দেন। তাঁদের মতে মানুষের কোনো লিঙ্গ-অনপেক্ষ, ইতিহাস-অনপেক্ষ, অবস্থান থাকা সম্ভব নয়। লিঙ্গমোচন করা কখনই সম্ভব নয় তবে লিঙ্গ-পরিচয়ের মধ্যে সাম্যভাবনা আনা যেতে পারে। এই নারীবাদীরা লিঙ্গ-অনপেক্ষ একটা বিশুদ্ধ তত্ত্বের স্তর স্বীকার করেন না। সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সম্ভাবনা বা এ প্রাইওরাই রিজ়ন-এর (a priori reason) সম্ভাবনা তাঁরা স্বীকার করেন না।

রিজ়নের ইতিহাস-সাপেক্ষতা স্বীকার করতে হলে রিজ়নও অনেকটা ধূসর ও অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে; তখন ফাজ়ি (fuzzy) লজিক, ভেগ (vague) লজিক, মেনি-ভ্যালুড (many-valued) লজিক, প্যারা-কনসিসটেন্ট (para-consistent) লজিক, ইত্যাদি ধ্রুপদী দ্বিকোটিক লজিকের চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।[২] র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা এভাবে প্রচলিত তন্ত্রে অন্তর্ভুক্তি নয়, প্রচলিত তন্ত্রের পুনর্বিন্যাসের কথা বলেন। তারই ফলস্বরূপ ধ্রুপদী দ্বিমাত্রিক লজিকের তাঁরা বিকল্প খোঁজেন।

নিছক পরিবর্তন আনতে হবে বা সংস্কার করতে হবে বলে যে তাঁরা বিকল্পের খোঁজ করছেন তা নয়। বিকল্প অনুসন্ধানটা একটা ফ্যাশন নয়, এটার একটা তাগিদ তাঁরা আন্তরিকভাবে অনুভব করেন। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মনে করেন যে কোনো কোনো চিন্তাতন্ত্র ও লজিকের ঘরানা ক্ষমতার মেরুকরণে প্রশ্রয় দেয়। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা যেহেতু তত্ত্ব ও প্রয়োগকে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করে বোঝেন তাই তাঁরা মানতে রাজি নন যে একটা তত্ত্বের সঙ্গে একাধিক চর্যার রীতি সংবদ্ধ থাকতে পারে। তাঁরা মনে করেন যে প্রতিটি লজিকের সিস্টেমের (logical system) সঙ্গে একটা করে র‍্যাশনাল প্র্যাকটিস (rational practice) যুক্ত রয়েছে। ফলে চর্যায় লিঙ্গ-সাম্য (gender equality) আনতে গিয়ে একই সঙ্গে সেই চর্যার নিয়ামক চিন্তাতন্ত্রে বদল আনতে হবে। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা সবসময় বৈষম্যের মূল কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। তাঁরা লিবারালদের মতো মনে করেন না যে সব জায়গায় সঠিক প্রিন্সিপলের অভাবেই লিঙ্গ-বৈষম্য দেখা দেয়। তাঁদের মতে স্বার্থপরতা (self interest) এবং ক্ষমতার (power) আস্ফালন বৈষম্যের জন্য দায়ী।

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মনে করেন যে সমাজের লিঙ্গ-বৈষম্যের বীজ লুকিয়ে আছে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের মধ্যে। যেখানে একটা অসম ক্ষমতার বন্টন, অবদমন ও বৈষম্য বাসা বেঁধে আছে—পরবর্তীকালে সেখান থেকেই লিঙ্গ-বৈষম্যকারী আচরণ সমাজের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। র‍্যাডিকালদের মতে লিবারালরা যখন আইনের সাহায্যে the personal is political-এর গণ্ডিতে সুরাহা চান তখন তাঁরা সমস্যার মূলে না-গিয়ে মূল থেকে সরে যান। বৃহত্তর সমাজে যা দেখি তার বীজ লুকোনো আছে ব্যক্তিগত সম্পর্কে অবস্থিত অবদমনে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, আশা-আকাঙক্ষার মধ্যে কাজ করে চলেছে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার কাঠামো।

পিতৃতন্ত্রে সর্বদাই ক্ষমতার একটা কেন্দ্র এবং সেই কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিত থেকে একটা প্রান্ত আছে বলে মনে করা হয়। এর ফলে পিতৃতন্ত্রে ক্ষমতার সমবন্টন কখনোই সম্ভব হয় না। মনে করা হয় যে ক্ষমতার কেন্দ্রে যে আছে তার সম্পূর্ণ বিপরীতে প্রান্তিক সমাজের অবস্থান। কেন্দ্রের প্রেক্ষিতটি যদি উত্তম হয়, সঠিক হয়, তাহলে প্রান্তের প্রেক্ষিতটি অধম এবং বেঠিক। প্রান্তের উন্নতিকল্পে প্রান্তকে কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

লিবারালদের এই ব্যাখ্যা র‍্যাডিকালরা মানতে প্রস্তুত নয়। তাঁরা মনে করেন, যে-তন্ত্রে কেন্দ্র আর প্রান্তের দুটি স্পষ্ট মেরু কল্পনা করা হয় সেখানে প্রান্ত কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত হবার পরে নতুন প্রান্ত সৃষ্টি হবে। কারণ ক্ষমতার দুটি বিপরীত কোটি কল্পনা না-করলে তন্ত্রটি একেবারেই টেকে না। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা এমন একটা তন্ত্র রচনা করার চেষ্টা করছেন যেখানে কেন্দ্র ও প্রান্তের দুটি স্পষ্ট কোটি নেই। তাঁরা বলেন দুটি পক্ষ ভিন্ন হয়েও সমান মূল্যবান হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা মনে করেন দুটি পক্ষ ভিন্ন হয়েও খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাঁরা, লিবারালদের মতো, ব্যক্তিকে একটি বিচ্ছিন্ন সত্তারূপে দেখতে চান না। র‍্যাডিকালরা বলেন প্রতিটি ব্যক্তি অপরাপর ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত এবং এই পারস্পরিকতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিক-সত্তা গড়ে ওঠে। র‍্যাডিকালদের কাছে selfhood construction বা ব্যক্তিক-সত্তা গঠনটা অত্যন্ত জরুরি ধারণা। লিবারালদের সেলফ বা ব্যক্তিকে atomic self বা আণবিক সত্তা বলা হয়; আর র‍্যাডিকাল বলেন hyphenated self বা সম্পর্কিত-সত্তার কথা। একটি সত্তা যদি অপর একটি সত্তার ওপর তার ব্যক্তিস্বরূপের জন্য নির্ভর করে, এবং এই নির্ভরশীলতার বোধ যদি পারস্পরিক হয়, তা হলে আর একের ওপর অপরের ক্ষমতার আস্ফালনের জায়গাটাই থাকে না।

ব্যক্তিক-সত্তা গঠনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করে যৌন-পরিচয় ও লিঙ্গ-পরিচয় কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে। নারী-পুরুষের যৌন-পরিচয় ও লিঙ্গ-পরিচয়ের ধারণা থেকে জন্ম নেয় ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিভিন্ন 'রাজনীতি'। ভাষা-প্রয়োগ, প্রবাদ, ইত্যাদি ব্যবহারে প্রতিফলিত হয় আমাদের যৌন এবং লিঙ্গ-ধারণা। যখন বলা হয় 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে', বা 'নারী নরকের দ্বার', তখন একটা সমাজের চিন্তার পরিমণ্ডলের পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তার পরিমণ্ডল নতুন করে ঢেলে সাজাতে না-পারলে ব্যক্তিগত সম্পর্কে লিঙ্গ-বৈষম্য থেকেই যাবে।

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা যে আইনের পরিবর্তন চান না বা মূলস্রোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে চান না, তা নয়। অন্তর্ভুক্তির প্রকল্প পুরোপুরি খারিজ করলে বিকল্প স্থান রচনা করতে সমর্থ না-হওয়া অবধি র‍্যাডিকাল নারীবাদীদের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। নিজের মতো করে পিতৃতন্ত্রের ছত্রছায়ার বাইরে কথা বলতে হলে নতুন বাগ্‌বিধি অনুশীলন করতে হবে। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মূলস্রোতকে পাশ কাটিয়ে যেতে চান না। নারী-পুরুষ যুগ্ম সহযোগে কাজ করুক সেটাই তাঁরা চান। অথচ এই যৌথভাবে কাজ করাটা পিতৃতন্ত্রের চৌহদ্দির ভেতরে থেকে তাঁরা করতে সম্মত নন। লিবারাল নারীবাদীরা যখন নারীপুরুষের মিলিত প্রচেষ্টার কথা বলেন তখন তাঁরা দুটি বিচ্ছিন্ন সত্তার মিলিত প্রয়াসের কথা বলেন। তাঁদের জোরটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে মিলনের স্থলটা হয়ে দাঁড়ায় প্রয়োজনভিত্তিক। সব মিলিত প্রয়াসে ধীরে ধীরে দেখা যায় একটি ক্ষমতার মেরুকরণ গড়ে ওঠে। তাছাড়া প্রতিটি সম্পর্কে চেষ্টা করা হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সম্পর্ক স্থাপন করার। এই সম্পর্কগুলিকে ধরে রাখে প্রয়োজন, স্বার্থ, একমুখী নির্ভরশীলতা, চুক্তি ইত্যাদি। সম্পর্কের প্রতিটি মাত্রাই যেন প্রিনসিপল-বিধি-আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা বহাল রাখা যায়। লিবারালরা মনে করেন যে সম্পর্ক রচনারও যেমন আইন আছে, তেমনি সম্পর্ক ভাঙারও আইন আছে। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত রূপে দেখেন। তাঁরা মনে করেন সম্পর্ক ছাড়া একক অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এর ফলে স্বাতন্ত্র্য বলতে তাঁরা বোঝেন সম্পর্কিত থেকেও নিজের ব্যক্তিগত স্বর প্রতিষ্ঠা করতে পারা। এইভাবে সম্পর্কের স্বরূপ যদি নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হয় এবং সম্পর্কের মাধ্যমে যদি পারসোনাল আইডেনটিটি (personal identity) বা ব্যক্তিক-স্বরূপ গড়ে ওঠে, সেই সঙ্গে স্বকীয়তার অর্থও যদি পুনর্বিবেচনা করতে হয় তাহলে চিন্তার পরিমণ্ডলে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন।

র‍্যাডিকাল ফেমিনিস্টরা মনে করেন যে আইনের মাধ্যমে মেয়েদের অবস্থার আপাত-উন্নতি সাধিত হলেও মূল সমস্যাটা অপরিবর্তিত থেকে যায়। তা-ই এঁদের আন্দোলনের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সচেতন হয়ে ওঠার প্রকল্প বা কনশাসনেস-রেজিং প্রোগ্রাম (consciousness-raising programme)। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে মেয়েরা তাদের অনুভবের কথা পরস্পরকে বলে। মনে করা হয় এটাও এক ধরনের সক্রিয় রাজনীতি। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তারা বুঝে নেবার চেষ্টা করে যে কোনটা মুক্তির স্বর আর কোনটা পিতৃতন্ত্রের শেখানো বুলি। কবিতা, গল্প, পথনাটিকা, সাহিত্যসভা, ইত্যাদির মাধ্যমে তারা জনমানসেও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে।

র‍্যাডিকাল নারীবাদ শুধু যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর খুব গুরুত্ব দেয় তা নয়। ক্রমে তারা জাতি-বর্ণভেদে নারীর অভিজ্ঞতার প্রভেদ নিয়েও বিচার করে। ইদানীং কে যে লিবারাল নারীবাদী আর কে যে বিশুদ্ধ র‍্যাডিকাল নারীবাদী তা বলা মুশকিল। কারণ উত্তর-আধুনিকদের সমালোচনার মুখে পড়ে উভয়েই প্রতিনিয়ত তাঁদের মতবাদের বদল করে চলেছেন। এর ফলে অনেক সময় লিবারালরা র‍্যাডিকালদের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন। আবার কখনো উত্তর-আধুনিকদের তুলনায় র‍্যাডিকালদের রক্ষণশীল বলে মনে হয়।

লিবারাল ও র‍্যাডিকাল নারীবাদের বিতর্কটি নৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিবাদ। নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সব সময় যুক্ত হয়ে থাকে একটা লজিক ও একটা জ্ঞান-তাত্ত্বিক (epistemological) প্রেক্ষিত। লিবারাল মতবাদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেক্ষিতেরও রদ-বদল হয়।

ধ্রুপদী লিবারাল প্রেক্ষিতের অনুগত লজিকের পরিচয় পাওয়া যায় রাসেল ও ফ্রেগের লেখায় এবং তার অনুগত জ্ঞান-তত্ত্বের ছবি পাওয়া যায় দেকার্ত ও কান্টের দর্শনে। এই ট্রাডিশনের ভেতর থেকে উত্তর-আধুনিকতার প্রতিবাদী স্বর কী-করে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল তার একটা একরৈখিক ইতিহাস এর পরের অধ্যায়ে ('নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ'-এ) দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

উত্তর-আধুনিকতা শুধু আধুনিক মতবাদ খণ্ডনের মাধ্যমে জন্ম নেয়নি। এর মূলে আছে অবভাস তত্ত্ব (phenomenology), অস্তিত্ববাদ (existentialism) ও সাংগঠনিকবাদ (structuralism)। অর্থাৎ সব মিলিয়ে যাকে ইউরোপীয় দর্শন বা কন্টিনেন্টাল ফিলজফি (continental philosophy) বলে তার একটা বড় অবদান।

আধুনিকদের সঙ্গে উত্তর-আধুনিকদের তর্কের বিস্তারিত রূপ পরের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।